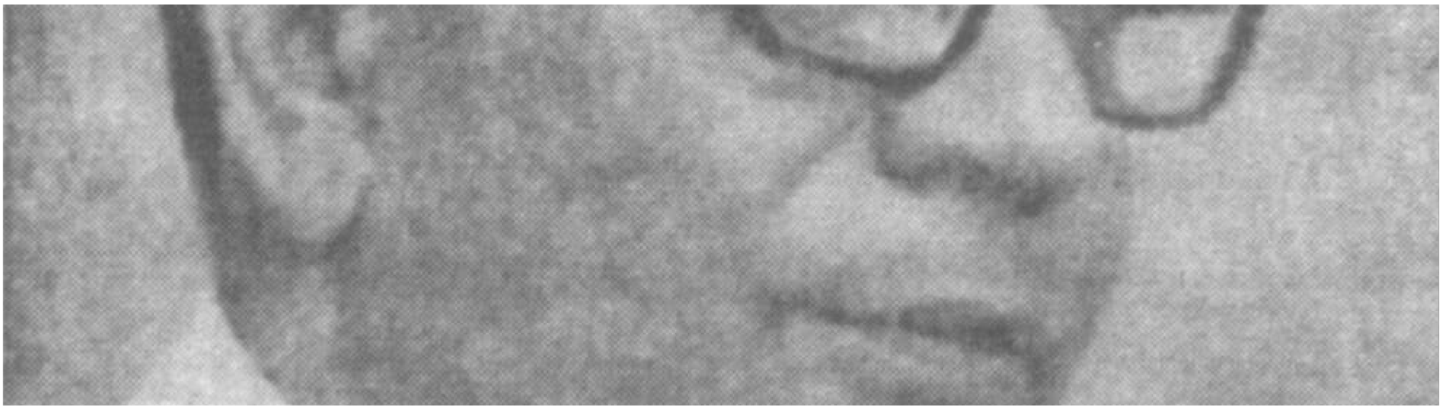

ইসলামের বন্ধুঃ এম. এন. রায় প্রসঙ্গে

ফাহমিদ-উর-রহমান

সঞ্চারণ
ঐতিহ্যের অনুরণন

মনস্বী, বিপ্লবী ও ভাবুক এম এন রায়ের ইসলাম ভাবনা তার রোমাঞ্চকর জীবনের মতই এক চমকপ্রদ ঘটনা। আজীবন ভ্রাম্যমাণ এই বিপ্লবী মানবমুক্তির সাধনায় দেশ থেকে দেশান্তরে ছুটে বেড়িয়েছেন এবং একই লক্ষ্যে নানা বিপরীত ধর্মী চিন্তা নিয়ে বিভিন্ন সময় তাকে কাজ করতে দেখা গেছে। জীবনের একটি মূহূর্তে এসে তিনি ইসলামকে নিয়েও কিছুটা চিন্তা-ভাবনা করেছিলেন বলে মনে হয়। সম্ভবতঃ এটি ছিল তার মানবমুক্তির সূত্রগুলো নিয়ে নানা রকম পরীক্ষা-নিরীক্ষার একটি অংশ। মুক্তি সাধনায় এই ভ্রাম্যমাণতার জন্য তার জীবনীকার তাকে বলেছেন Restless Brahmin.

বিশ্ব কমিউনিস্ট আন্দোলনের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা লেলিন, ট্রটস্কি ও স্ট্যালিনের সহকর্মী এই রায়ের পৈত্রিক নাম ছিল নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, যিনি বঙ্গভঙ্গের সময় খুব তরুণ বয়সে বাঘা যতিনের নেতৃত্বে সন্ত্রাসবাদী বৈপ্লবিক সংগঠনের সাথে যুক্ত হয়েছিলেন। তখনকার মতো বঙ্কিমচন্দ্র ও বিবেকানন্দের ভাবাদর্শ তাকে অনুপ্রাণিত করেছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় তিনি ও তার সহকর্মীরা জার্মানীর সহায়তায় সশস্ত্র অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ভারত স্বাধীন করবেন বলে পরিকল্পনা করেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি অস্ত্র সংগ্রহের জন্য সাগর পেরিয়ে বাটাভিয়াতে যান। কিন্তু সেই চেষ্টা ব্যর্থ হওয়ায় নরেন নিরাশ না হয়ে অস্ত্রের সন্ধানে ইন্দোনেশিয়া, জাপান, কোরিয়া, চীন, ফিলিপিন প্রভৃতি নানা দেশ ঘুরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে হাজির হন। উদ্দেশ্য ছিল জার্মান সাবমেরিনে ইউরোপ পৌঁছুবেন এবং বার্লিনে গিয়ে জার্মান সরকারের সাথে অস্ত্র সরবরাহের ব্যাপারে পাকাপাকি আলোচনা করবেন। কিন্তু মার্কিন সরকার যুদ্ধে ইংরেজের পক্ষে যোগ দেয়াতে তিনি মেক্সিকোয় পালিয়ে যান। পালিযে যাওয়ার সময় তিনি নতুন নাম নেন মানবেন্দ্রনাথ রায় এবং এই নামেই তিনি বিশ্ববিখ্যাত হন। রায় তার স্মৃতিকথায় লিখেছেন এই ভাবে তার পুনর্জন্ম ঘটে এবং এই নাম তাকে ব্যর্থ অতীত থেকে রোমান্টিক ও কৃতিত্বপূর্ণ ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে নিতে সাহায্য করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে থাকতেই তার সোশালিস্টদের সাথে পরিচয় ঘটে এবং সেই সূত্রে মার্কসের রচনাবলীর দ্বারা তিরি গভীরভাবে প্রভাবিত হন। সোশালিস্টদের সংস্পর্শে তার ভাবজগতে এক ধরনের পরিবর্তন ঘটে। তিনি বদলে যেতে থাকেন এবং অস্ত্রের চিন্তা ত্যাগ করে মার্ক্সবাদের আওতায় মানুষের মুক্তির সন্ধান করবেন বলে সিদ্ধান্ত নেন।

রায় মেক্সিকোর রাজনীতিতে খুব দ্রুত মিশে যান, সেখানে আড়াই বছর ধরে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আন্দোলনে সক্রিয় থাকেন এবং এল পার্তিদো কমুনিস্তা দ্যা মেহিকো (মেক্সিকোর কমুনিস্ট পার্টি) প্রতিষ্ঠা করেন। এরপর রায় লেনিনের আমন্ত্রণে মস্কো আসেন এবং কম্যুনিস্ট আন্তর্জাতিকের দ্বিতীয় কংগ্রেসে তিনি তার বিশ্লেষণী প্রতিভা ও স্বাধীন চিন্তার পরিচয় দেন। সেই সূত্রে লেনিন ও অন্যান্য মার্ক্সবাদী নেতাদের কাছে তিনি তাত্ত্বিক হিসেবে স্বীকৃতি অর্জন করেন। লেনিন তখন রাশিয়ার সর্বাধিপতি ও কম্যুনিস্ট জগতে তার প্রভাব অপ্রতিহত। তার সাথে ভিন্নমত পোষণ করার কথা রাশিয়ায় তখনকার মতো কারো চিন্তায়ও আসেনি। কিন্তু মানবেন্দ্রের সাথে লেনিনের উপনিবেশগুলোতে সাম্রাজ্যবাদ ও পুঁজিবাদ বিরোধিতার কৌশল নিয়ে এই কংগ্রেসে কিছুটা মতানৈক্য হয়েছিল। কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাসে লেনিনের পরই রায়ের স্থান- যিনি মার্ক্সবাদের সংশোধন করার চেষ্টা করেছিলেন।

এই সময় রায় রাশিয়ার নতুন কমিউনিস্ট বিপ্লবকে সংহত করার জন্য মধ্য এশিয়ায় কাজ করেন। পরে পার্টির সিদ্ধান্ত অনুসারে তিনি চীনে যান সেখানকার কমিউনিস্ট বিপ্লবকে এগিয়ে নিয়ে আসার কাজে সাহায্য করতে। চীনে বিপ্লব ঘটানোর পথ ও পদ্ধতি নিয়ে রায়ের সাথে রাশিয়ার নতুন নেতা স্ট্যালিনের মতবিরোধ হয়। এই মতবিরোধের পথ ধরে ভিন্নমতের প্রতি অসহিষ্ণু স্ট্যালিন রায়কে কমিউনিস্ট পার্টি থেকে বহিস্কার করেন। এ ঘটনাকে রায় উগ্রবামপন্থা হিসেবে উল্লেখ করেছেন।

এইভাবে রায়ের সাথে কমিউনিস্ট পার্টির সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায়। তিনি তার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা দিয়ে বুঝতে পারেন কমিউনিজম আদর্শ হিসেবে আশাব্যঞ্জক হলেও বাস্তব রূপায়ণে এটি একটি কর্তৃত্বপরায়ণ ও স্বৈরাচারী ব্যবস্থা এবং মানবিকতার ক্ষেত্রে ব্যবহারিক কমিউনিজম পুঁজিবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের চেয়ে গুণগত শ্রেষ্ঠত্বের দাবি করতে পারে না। এক্ষেত্রে রায় কমিউনিজমের যে শ্রেষ্ঠতা আশা করেছিলেন অসীম বেদনার সঙ্গে তাকে নৈরাশ্য কবুল করতে হয় এবং কমিউনিজম নিয়ে তার স্বপ্নভঙ্গ সম্পন্ন হয়।

শেষ পর্যন্ত রায় ভারতে ফিরে আসেন। তিনি জানতেন দেশে ফেরামাত্রই ব্রিটিশ তার রাজবিরোধী সংগ্রামের জন্য জেলে পাঠাবে। তিনি ঝুঁকি নেন এবং অবশেষে গ্রেফতার হন। জেলে বসে রায় তার অসাধারণ উদ্ভাবনী শক্তি দিয়ে চিঠিপত্র, ইস্তেহার, প্রবন্ধ এমনকি কয়েকটি বইয়ের পাণ্ডুলিপি তৈরি করেন। বহুভাষী এই পণ্ডিত জেলের ভিতরেই নতুন করে লেখাপড়া ও ভাবনা চিন্তা শুরু করেন এবং মার্ক্সবাদ, লেনিন, স্ট্যালিন, দর্শন, বিজ্ঞান, জাতীয়তাবাদ প্রভৃতি বিষয়কে নতুন করে পুনর্মূল্যায়ন করেন। এভাবে তিনি পূর্বেকার ভাবনা থেকে সরে আসেন। তিনি বুঝতে পারেন মার্ক্সসীয় চিন্তার মধ্যে স্ববিরোধিতা ও মৌলিক ত্রুটি রয়েছে। তিনি মানবমুক্তির নতুন উপায় খুঁজতে শুরু করেন এবং এই পর্যায়ে সত্যিকার অর্থে তার ইসলামের সাথে পরিচয় ঘটে। এই পরিচয়ের ফল হচ্ছে তার সুবিখ্যাত Historical Role of Islam বইটি। জেলে বসেই তিনি এটি রচনা করেন এবং ১৯৩৯ সালে তার জেল থেকে মুক্তি পাবার পর এটি পুস্তক আকারে প্রকাশিত হয়। শিক্ষিত ভারতীয় মুসলমানদের মধ্যে রায়ের যে জনপ্রিয়তা তা মূলত এই বইটির কারণে।

মানবেন্দ্র এই বইটিতে ইতিহসের রঙ্গমঞ্চে ইসলামের ভূমিকাকে একজন জড়বাদী, যুক্তিবাদী হিসেবে বিশ্লেষণ করেছেন। তিনি শেষ পর্যন্ত একজন জড়বাদীই থেকে যান। ভাববাদে তার কখনোই রূপান্তর ঘটেনি। কিন্তু এই বইটিতে দেখবার বিষয় হলো জড়বাদী কমিউনিস্ট কিংবা পাশ্চাত্যের উদার নৈতিক চিন্তা-ভাবনার প্রাণিত মানুষেরা যেমন করে ধর্ম বিশেষ করে ইসলামকে সচরাচর সাম্প্রদায়িকতা, প্রতিক্রিয়াশীলতা ও প্রগতিবিরুদ্ধ হিসেবে বিবেচনা করে থাকেন মানবেন্দ্র এই বই লিখতে গিয়ে সে কাজটি করেননি। এখানেই তার উদার ও মুক্ত মন-মানসিকতার পরিচয় মেলে।

এই বইটি যখন লেখা হয় তখন ভারতের হিন্দু মুসলমান সাম্প্রদায়িক সমস্যা জটিল ও কূটিল হয়ে উঠেছে। বাইরের রাজনৈতিক তাপ ও চাপ এ বইতে আদৌ কোন প্রভাব ফেলতে পারেনি। বইটির শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত লেখকের এক অসাম্প্রদায়িক চিত্ত কর্তৃত্ব করেছে। রায়ের এই বইটিতে আর একটি দেখার বিষয় হলো তিনি ইসলামের ভূমিকাকে ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে বিশ্লেষণ করেছেন। কিন্তু আধুনিককালে বিকল্প ব্যবস্থা হিসেবে ইসলাম কোন প্রগতিশীল ভূমিকা রাখতে পারে কিনা সে সম্বন্ধে তিনি কোন মন্তব্য করেননি। তার মত ভাবুকের দৃষ্টিতে যে ইসলাম পৃথিবীর রঙ্গমঞ্চে একদিন বৈপ্লবিক ভূমিকা রেখেছিল তা আজকের যুগে কেন সেই জীবনীশক্তি নিয়ে পুনরায় হাজির হতে পারবে না তার বিশ্লেষণ থাকলে বইটি অবশ্যই আরো মূল্যবান হতে পারতো। হয়তো তৎকালীন ইসলাম প্রধান জনগোষ্ঠীর উপনিবেশিত অবস্থা, মুসলিম বুদ্ধিবৃত্তির দৈন্যদশা, মুসলিম সমাজে রাজনৈতিক-সামাজিক অস্থিরতা ইত্যাদি তার সামনে কোন প্রতিশ্রুতি সৃষ্টি করেনি। শুধুমাত্র ইতিহাসের ইসলামই তাকে আকর্ষণ করেছে। পরবর্তীকালে রেডিক্যাল হিউম্যানিজমের দিকে তার ঝুঁকে পড়াও এর একটা কারণ হতে পারে।

রায় তার এই বইয়ে কাব্যিক ভঙ্গীতে ও অত্যন্ত সাবলীল ভাষায় ইসলামের বিজয় কাহিনী বিবৃত করেছেন। রায় ইসলামকে নিছক ধর্ম হিসেবে না দেখে একে একটি রাজনৈতিক ও সমাজদর্শন হিসেবে বিবেচনা করেছেন। তার মত হচ্ছে দুনিয়ার এক জরাজীর্ণ সামাজিক, রাজনৈতিক, বুদ্ধিবৃত্তিক অবস্থার প্রেক্ষাপটে ইসলামের আবির্ভাব হয়েছিল। এই কারণেই ইসলামের নতুন বাণী সেদিন শোষিত ও নিপীড়িত মানুষের সামনে প্রতিশ্রুতি সৃষ্টি করেছিল। ইসলাম ধর্মের সাম্যবাদী প্রেরণা ও মানুষের জন্য একটি ন্যায়সঙ্গত মানবিক ও সমাধিকার সম্পন্ন সমাজ গড়ে তোলার প্রত্যয় মানুষকে কাছে টেনেছিল সবচেয়ে বেশি। রায় ইতিহাস থেকে নজির তুলে এনে বলেছেন, সমকালীন সমাজের দুর্নীতি, অবিচার, স্বেচ্ছাচার, জুলুম, কুসংস্কার থেকে বাঁচবার জন্য মানুষ ইসলামকে ত্রাণকারী হিসেবে অভিনন্দন জানিয়েছিল। রায়ের নিজের কথা হচ্ছে The Revolt of Islam Saved Humanity.

রায় বরং ইসলামের সেই সব নিন্দুক ও সমালোচকদের এক হাত নিয়েছেন যারা নাকি বলে বেড়িয়েছে ইসলাম তরবারীর জোরে প্রচারিত হয়েছিল। রায়ের কথা হচ্ছে ইসলাম ইতিহাসের প্রয়োজনে এসেছিল এবং মানবপ্রগতির ক্ষেত্রে এক বড় ভূমিকা রেখেছিল। এর আদর্শ একটি নতুন সামাজিক সম্পর্ক তৈরি করেছিল এবং ফলস্বরূপ মানুষের ভাবজগতে এক বৈপ্লবিক রূপান্তরের সূচনা হয়েছিল। ইসলামের আগমন ছাড়া পূর্বতন সমাজগুলো ইতিহাসের সচলতা এগিয়ে নিতে পারতো না। রায় তার বইতে যে ইসলামকে আবিষ্কার করেছেন তার মধ্যে ধর্মের ডক্ট্রেনিয়ার বা থিয়লজিকাল উপাদান তেমন একটা নেই। সেখানে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে সমাজ পরিবর্তনের ইতিহাসে ইসলাম কি গৌরবউজ্জ্বল ভূমিকা পালন করেছিল তাই। সামাজিক

বিবর্তনের ভিতর দিয়ে ইসলামকে ব্যাখ্যা করার মধ্যে তার উপর ইতিহসের সমাজতান্ত্রিক ব্যাখ্যারও একটা প্রভাব লক্ষ্য করা যায়।

রায় লিখেছেন, ইসলাম আসার আগে সামাজিক ন্যায়ের ধরণাটা তৎকালীন পরিবেশে একরকম অজানাই ছিল। শোষিতদের আরো শোষিত হওয়াই ছিল নিয়তি। মানুষ হিসেবে তাদের কোন মর্যাদাই ছিল না। ইসলামের নীতি সামাজিক সম্পর্কের চিরাচরিত ধারণাগুলো উল্টো-পাল্টা করে দেয়। নতুন নীতি উৎপাদন ও ভোগের পুরনো ব্যবস্থায় বৈপ্লবিক পরিবর্তন সৃষ্টি করে। উৎপাদক তার উৎপাদিত পণ্যের একটি অংশ ভোগ করার ন্যায়সঙ্গত অধিকার পায়- যা পূর্বে সে পেতো না। এর ফলে নতুন ইসলামী রাষ্ট্রে ব্যবসা বাণিজ্যের দ্রুত স্ফীতি ঘটে। আরব ব্যবসায়ীদের বিপুল ক্ষেত্রে প্রস্তুত হয়। রায়ের ব্যাখ্যা হচ্ছে এইভাবে একদিকে ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসার, সম্পদের আহরণ আর অন্যদিকে সকলের সহযোগে করা যায় এমন একটা কাজের ভেতর দিয়ে উম্মাহর ঐক্য ধরে রাখাই ছিল ইসলামের খলিফাদের একটা বড় উদ্দেশ্য। তার মতে নতুন রাষ্ট্রের দ্রুত বর্ধনশীল ব্যবসা বাণিজ্য মুসলমানদের ভেতরে একটা কসমোপলিটানিজমের মনোভাব সৃষ্টি করে। নতুন নতুন মানুষ ও তাদের আচার ও রীতি-নীতির সাথে তাদের পরিচয় হয়। এর ফলে তাদের পুরনো সংস্কার ও সীমাবদ্ধতাগুলো খসে পড়ে। তারা সহনশীলতা, সহানুভূতি, অন্যকে বুঝবার ক্ষমতা, সবকিছুর গভীরে গিয়ে তার সারোৎসার আহরণ করার দক্ষতা, বিশ্লেষণী মন প্রভৃতি অর্জন করায় তাদের ভেতরে একটা দার্শনিক প্রত্যয় সৃষ্টি হয়। এইভাবে ইসলামের ইতিহাসে দেয়া ও নেয়ার যে রেওয়াজ তৈরি হয় তাই দিয়ে মুসলিমরা যেমন নিজেদের সভ্যতাকে এগিয়ে নিয়ে যায় তেমনি ভিনদেশী সভ্যতাকেও অনেকখানি সমৃদ্ধ করে। তবে রায়ের এইভাবে ইসলামের মানবতাবাদী প্রত্যয়কে উৎপাদন ব্যবস্থার সাথে মিলিয়ে ব্যাখ্যা করার পদ্ধতিতে সবাই খুশী হবেন না অথবা সে ব্যাখ্যার সঙ্গে একমত হবেন না- এটা স্পষ্ট। কারণ ইসলামে মানবতাবাদ ও ভ্রাতৃত্বের ধারণার বিকাশ হয়েছে তৌহীদের নীতির ভিত্তিতে। মুসলিম সমাজের মানবতাবাদের ধারণাটা ঠিক ভাষার, রক্তের, বর্ণের, শ্রেণীর, অঞ্চলের বা উৎপাদন ব্যবস্থাকে ভিত্তি করে গড়ে ওঠে নাই। এটা গঠিত হয় বিশ্বাসের ভিত্তিতে।

> তবে বাণিজ্যিক প্রসারণের তত্ত্বের সাথে ইসলামের বিজয়কে মিলিয়ে দেখার পাশাপাশি রায় ইসলামের ব্যাপক গ্রহণযোগ্যতার অন্য কারণ হিসেবে এর সহনশীলতা ও সমতাবাদী বৈশিষ্ট্যের কথা বলেছেন। আসল কথা হচ্ছে ইসলাম এই সহনশীল ও সমতাবাদী বৈশিষ্টের পূর্বশর্ত তৈরি করেছিল- যা আরব ব্যবসায়ীদের বাণিজ্যিক প্রসারণের ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছিল, এই কথাটা রায় উল্লেখ করলে তার ইতিহাসের ব্যাখ্যা আরও সমৃদ্ধ হতো বলে মনে হয়।

তবে রায় এই বইতে বিভিন্ন প্রসঙ্গে ইসলামের সমতাবাদী ও ভ্রাতৃত্ববাদী বৈশিষ্ট্যের কথা বার বার উচ্চারণ করেছেন। তার মতে তৎকালীন রোমান, বাইজেন্টাইন, পারসিক ও ভারতীয় সমাজের শোষণমূলক বর্ণবাদী ব্যবস্থার বিপরীতে ইসলাম স্বাধীনতা ও সাম্যের কথা বলেছিল। যার কথা ঐসব এলাকার জনগণ প্রায় ভুলতে বসেছিল। প্রাচীন সভ্যতারগুলোর শাসকশ্রেণীর নৈতিক, বুদ্ধিবৃত্তিক ও আধ্যাত্মিক অবক্ষয়ের প্রেক্ষাপটে সাধারণ মানুষ এক মুক্তির আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করছিল। ইসলাম তাদের কাছে সেই মুক্তির প্রতিশ্রুতি নিয়ে আসে এবং একে একে সিরিয়া, পারস্য, ইজিপ্ট, আফ্রিকা ও আন্দালুসিয়ার নির্যাতিত মানুষ ইসলামকে স্বাগত জানায়। শুধুমাত্র সামরিক শক্তির জোরে এই বিপুল এলাকার জনগোষ্ঠীকে পরাজিত করা সম্ভব ছিল না।

রায় সামাজিক শক্তি হিসেবে ইসলামের অভূতপূর্ব ভূমিকার কথা বললেও এর পিছনে যে মানুষটির অসাধারণ ব্যক্তিত্ব ক্রিয়াশীল ছিল সেই ইসলামের নবীর ভূমিকাকে সত্যিকারের মূল্যায়ন করতে পারেননি। কারণ ইউরোপের রেশনালিস্টদের মতই তিনি নবুয়ত, তৌহীদ, ওহী ও কোরআন শরীফের বাণীকে বিশ্লেষণ করতে গিয়ে শুধু শুধু গলদঘর্ম হয়েছেন। তবে যুক্তির জগত যতই শক্তিশালী হোক না কেন তা কিন্তু ভাবজগতকে পরোপুরি ব্যাখ্যা করতে অক্ষম। আবার ভাবজগতের অস্তিত্বের পিছনেও এমন একটা সামর্থ্য আছে যার কারণে পৃথিবীর কোটি কোটি নর-নারী আজও ধর্মের কাছ থেকে অনন্ত শক্তির প্রেরণা পেয়ে থাকে। রায় স্বাভাবিকভাবে ইসলামের যুক্তিবাদী ধারা এবং ইতিহাসে এর ভূমিকা দেখে উল্লসিত হয়েছেন। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে ইসলামের যুক্তিবাদী ধারা ভাববাদী ধারাকে বাদ দিয়ে কখনোই প্রবাহিত হয়নি। ইসলামকে বুঝতে হলে এই দুই ধারাকে সামগ্রিকভাবে বুঝতে হবে- যা রায় করতে পারেননি। ইসলামের ইতিহাসে যেমন একদিকে রয়েছে আল কিন্দি, আল হাসান, আল ফারাবী, ইবনে সিনা, ইবনে রুশদের বুদ্ধিবাদী ধারা তেমনি আছে ইমাম গাজ্জালী, ইবনে তাইমিয়া, ইমাম আবু হানিফা, মাওলানা রুমীর মানবিক ইসলামের ধারা। এই দুই ধারা নিয়েই ইসলামের জ্ঞান কাঠামো গড়ে উঠেছে। ইসলামের এই জ্ঞানতাত্ত্বিক স্রোতধারা স্পেনের ভেতর দিয়ে ইউরোপে গিয়ে আঘাত হানে। সেই আঘাতে রোজার বেকনের মতো মানুষ জেগে ওঠে এবং ইউরোপের নবজাগরণ বা রেনেসাঁর শুরু হয়। রায় অবশ্য ইসলামের এই বুদ্ধিবাদী ধারার নতুন করে বিকাশের প্রয়োজনীয়তার কথা গোপন করেননি। এ বইতে রায় ভারতে ইসলামের বৈপ্লবিক ভূমিকার কথাও আলোচনা করেছেন।

তিনি মনে করেন ইসলামের সামাজিক কর্মসূচীই সেদিন অধিকার ভেদের উপর প্রতিষ্ঠিত ভারতের নিপীড়িত মানুষকে কাছে টেনেছিল বেশি। নচেত ইসলাম ভারতের গণজীবনের গভীরে প্রবেশ করতে পারতো না। রায় লিখেছেন, ভারতের হিন্দুরা যদি ইসলামের এই বৈপ্লবিক অবদানকে সহজে স্বীকার না করে নেয় তাহলে হিন্দু-মুসলমানের পারস্পরিক সম্পর্ক কখনোই গভীর হবে না। তখনকার হিন্দু-মুসলমান রাজনীতির তিক্ত সম্পর্কের দিকে ইঙ্গিত করে রায়ের এই মতামত যে অত্যন্ত মূল্যবান ছিল তা বলাই বাহুল্য। বইটি লেখা হয়েছিল ভারতীয় ইতিহাসের একটি ক্রান্তিকালে যখন হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক এক অবিশ্বাসের দোলায় দুলছিল। তখন এই সন্দেহের প্রাচীন ভেঙ্গে অপর সভ্যতাকে বুঝবার রায়ের এই চেষ্টা তার উদার ও সহনশীল দৃষ্টিভঙ্গির উদাহরণ। এই দৃষ্টিভঙ্গি সামাজিক ন্যায়, বহুত্ব ও বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার জন্যও জরুরী। সাম্প্রতিক সময়ে পশ্চিমে ইসলামকে মধ্যযুগীয় ও বর্বর ধর্ম হিসেবে তুলে ধরার যে চেষ্টা দেখি, ক্লাস অব সিভিলাইজেশনের তত্ত্ব প্রচারের নামে ইসলামের বিরুদ্ধে যে ঘৃণার প্রকাশ দেখি তা আসলে সেখানকার নীতিনির্ধারকদের অসহনশীল ও উগ্র মনমানসিকতার ফসল বলা যায়। সেকুলার জড়বাদী বলে পরিচিত পশ্চিমা বিশ্বের এই যুক্তিহীন আচরণের ব্যাখ্যা কোথায়? রায়ের বইটি আজকের দিনে মুসলমানের সমস্যাদি সমাধানে কোন ভূমিকা রাখতে পারবে না সত্য, কিন্তু তার খোলা মন মানসিকতা যে পারস্পারিক সহাবস্থান প্রতিষ্ঠার পক্ষে অনেকের চোখ খুলে দেয়ার ক্ষমতা রাকে তা অবশ্য বলা যায়। আজকের দিনে বইটির মূল্য এখানেই।

কারামুক্তির পর রায় ভারতীয় মুক্তি আন্দোলনকে সক্রিয় করতে স্বল্পকালের জন্য কংগ্রেসে যোগ দেন বটে, কিন্তু কংগ্রেসের আধা সামন্ততান্ত্রিক নেতৃত্ব বিশেষ করে গান্ধীর যুক্তি বিমুখ, আপসপন্থী, অতীতমুখী চিন্তাভাবনার মধ্যে তিনি নিজেকে কখনোই মেলাতে পারেননি। তাই কংগ্রেসেও শেষ পর্যন্ত তার থাকা হয়নি। এরপর থেকে মানবেন্দ্র ভারতীয় জনগণের মুক্তির জন্য সাংস্কৃতিক বিপ্লবের প্রয়োজন বোধ করতে থাকেন এবং তিনি সক্রিয় রাজনীতি থেকে সরে এসে এক নব্য দর্শন রচনায় নিজেকে নিয়োজিত করেন। এই নব্য দর্শনের নামই ছিল রেডিক্যাল হিউম্যানিজম। এটা সত্য তার এই দর্শনের প্রভাব ভারতীয় জনসমাজে তেমন একটা পড়েনি।

যাই হোক রেডিক্যাল হিউম্যানিজমের প্রবক্তা হলেও মানবেন্দ্র কিন্তু ভারতবর্ষের প্রধান সংখ্যালঘু সম্প্রদায় মুসলমানদের সমস্যাগুলো গভীরভাবে বোঝার চেষ্টা করেছিলেন। চল্লিশের দশকের শেষ দিকে রায় যখন ঢাকা আসেন তখন অনেক তরুণ শিক্ষিত মুসলমান তার মানবতন্ত্রী চিন্তাভাবনায় কিছুটা অনুপ্রাণিতও হন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সলিমুল্লাহ মুসলিম হলে তমুদ্দুন মজলিস আয়োজিত এক সভায় রায় ইসলামের উপর এক চমৎকার বক্তৃতা দিয়েছেন বলে জানা যায়। শেষ পর্যন্ত রায় ইসলামকে রাজনীতির একটি বিকল্প পথ হিসেবে সাব্যস্ত না করলেও তিনি ইসলামের একজন প্রগতিশীল বন্ধু থেকে যান।

সূত্রঃ বিবা প্রকাশনী প্রকাশিত “ইসলামের ঐতিহাসিক ভূমিকা” গ্রন্থের পরিশিষ্ট-২

ফাহমিদ-উর-রহমান

ফাহমিদ-উর-রহমান একজন মননশীল প্রাবন্ধিক ও বুদ্ধিজীবী। পেশায় মনোরোগ বিশেষজ্ঞ হলেও ইতিহাস, সংস্কৃতি, ধর্ম, সমাজ ইত্যাদি বিষয় নিয়ে তিনি লিখছেন। সমাজ ও সংস্কৃতি সচেতন বিধায় তিনি আধুনিকতার সমস্যা নিয়ে লিখেছেন। আধুনিকতা ও সাম্রাজ্যবাদের সমস্যা থেকে উত্তরণের পথ নিয়েও তিনি কথা বলেছেন। তার ঋদ্ধ লেখালেখি নতুন আঙ্গিকে বাঙালি মুসলমানের জাতিসত্তার উপরে আলোকপাত করেছে। তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থের নামঃ ১। ইকবাল মননে অন্বেষণে (১৯৯৫) ২। অন্য আলোয় দেখা (২০০২) ৩। উত্তর আধুনিকতা (২০০৬) ৪। সেকুলারিজমের সত্য মিথ্যা (২০০৮) ৫। উত্তর আধুনিক মুসলিম মন (২০১০) ৬। সাম্রাজ্যবাদ (২০১২) ৭। বাংলাদেশ জিন্দাবাদ (২০১৩) ৮। সাংস্কৃতিক আগ্রাসন ও বাংলাদেশ (২০১৪) পাশাপাশি তাঁর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়েছে ১। জামাল উদ্দীন আফগানী: নব প্রভাতের সূর্য পুরুষ (২০০৩) ২। মহাবিদ্রোহ ১৮৫৭ (২০০৯) ৩। ফরায়েজী আন্দোলন : আত্মসত্তার রাজনীতি (২০১১)